# আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়

ময়ূরাক্ষী সেন

সকালে পত্রিকার পাতা উল্টালেই আমরা দেখতে পাই 'গৃহবধুর আত্মহত্যা' কিংবা 'আশানুরূপ ফল না পাওয়ার জন্য ছাত্রের আত্মহত্যা'। এখন এটি এতোই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে যে আমরা তেমন আমলে না নিয়ে এড়িয়ে চলে যাই। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে এতোটাই স্বাভাবিক? মানুষ তার জীবনে কোন পর্যায় গেলে আত্মহত্যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে? ২০০০ সাল থেকে প্রতি ১০ সেপ্টেম্বর পালন করা হচ্ছে আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। পৃথিবীতে ৭ লাখের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করছে। যার ৭৭% ঘটছে মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। সুতরাং বিষয়টি মোটেও এড়িয়ে যাওয়ার মতো না।

দেখা গেছে এই আত্মহত্যা করা মানুষগুলোর মধ্যে তরুণ ও ছাত্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার সাথে প্রবীণদের আত্মহত্যা করার প্রবণতাও দিন দিন বাড়ছে। চোখে পড়বার মতো আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যাবার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা আধুনিকতাকে দায়ী করছে। এছাড়া একাকীত্ব, বিষণ্নতা ও উদ্বেগের মতো নানাবিধ মানসিক রোগ দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরুষদের তুলনায় নারীদের আত্মহত্যার হার বেশি বলে জানা গেছে। তবে পুরো পৃথিবীতে নারীদের থেকে পুরুষের আত্মহত্যার হার বেশি। এছাড়া ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে। এমনকি অনেক ষাটোর্ধ প্রবীণরাও আত্মহত্যা করছে।

## নারীর আত্মহত্যার কারণ

নারীদের আত্মহত্যার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দাম্পত্য কলহ, একাকিত্ব ও নানা পারিবারিক সমস্যা। একটা সময় ইভটিজিংয়ের জন্য প্রচুর নারী আত্মহত্যা করত। কিন্তু ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর আইন হবার কারণে আত্মহত্যার হার কমে গেছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলে এসিড নিক্ষেপের ফলে অনেক নারী আত্মহত্যা করত। এসিড নিক্ষেপ কমার ফলে এখন এমন ধরনের আত্মহত্যাও হারও কমে গেছে। তবে এখনও আমাদের সমাজের নারীরা অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং যেকোনো কিছুতেই তাদের দোষারোপ করা হয়। যেমন একটি দম্পতির যদি সন্তান না হয় সব অপবাদ দেয়া হয় নারীকে। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসেবেও নারীকে দায়ী করা হয়। ছোট বেলা থেকেই পরিবার ও সমাজের নানা অপবাদ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীরা একপর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন।

নারী আত্মহত্যা কমাতে প্রথমে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ আমাদের সমাজে নারীরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলেই অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। আত্মহত্যার আরেকটি কারণ হচ্ছে নারী নির্যাতন। তবে আশার খবর হচ্ছে, দেশের নারী নির্যাতন আইন অনেক শক্তভাবে পালন করা হয়ে থাকে। নারী নির্যাতন কমাতে পারলে আত্মহত্যার মতো কঠিন পদক্ষেপ নারীদের নিতে হবে না। নারীদের নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে হবে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের সাথে অন্যায় হলে চুপ করে না থেকে প্রতিবাদ করতে হবে। কারণ আত্মহত্যা কোনোদিন কোনোকিছুর সমাধান না।

## পুরুষের আত্মহত্যা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি আত্মহত্যা করলেও পুরুষদের সংখ্যাও কম না। করোনার সময় এর হার আরো বেড়েছে। জানা গেছে, করোনাকালীন সময় পুরুষরা মানসিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালে যোগাযোগ করেছে। এবং তাদের বেশিরভাগ ৪৫ বছরের উর্ধ্বে। নারীরা অতিরিক্ত আবেগতাড়িত হয়ে আত্মহত্যা করলেও পুরুষরা অর্থনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তার কারণে আত্মহত্যা করে থাকে। করোনাকালীন সময় অনেক পুরুষ তাদের চাকরি হারিয়েছে ও অনেকের ব্যবসায় বিশাল অংকের টাকার ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারের আয়ের উৎস পুরুষেরা। তাই অনেক পরিবার করোনাকালীন সময় তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে। এইসময়ে অনেক পুরুষ মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমাদের এমন চিন্তাভাবনা থেকে বের হতে হবে যে সমাজ ও পরিবারের সব দায়িত্ব শুধু একজন পুরুষের। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। তাই যেকোনো কাজ নারী ও পুরুষ দুজনকেই করতে হবে তাহলে কারো একার উপর বাড়তি চাপ পড়বে না। মানুষ হিসেবে যেকোনো পরিস্থিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কারণ অর্থনৈতিকভাবে ওঠানামা সমাজে থাকবেই। তাই সেই খারাপ সময়ে মনোবল না হারিয়ে ঠান্ডা মাথায় সমস্যা মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিতে হবে।

## তরুণ ও ছাত্রদের আত্মহত্যা

বলা হয়ে থাকে নতুন প্রজন্মের কাছে নাকি আত্মহত্যা একটি ছেলেখেলা হয়ে গেছে। তরুণ ও ছাত্রদের আত্মহত্যা কারণগুলো মধ্যে হচ্ছে প্রেমে বিচ্ছেদ, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, মা বাবার বিচ্ছেদ, মাদকাসক্ত ইত্যাদি। বুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্ররা পড়ালেখা করে। কিন্তু সেস্থানেও ঘটছে অনেক আত্মহত্যা। তাছাড়া অনেক মধ্যবিত্ত ছেলেদের মধ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাড়া থাকে। সেই মানসিক চাপ না নিতে পেরেও আত্মহত্যা করছে। পড়ালেখা শেষ করেও যোগ্য চাকরি না পেয়ে অনেক ছেলেকে বেকার ঘুরতে হচ্ছে, এটিও আত্মহত্যার কারণ।

তরুণ বয়সে অনেক সিদ্ধান্ত আমরা হুটহাট নিয়ে ফেলি। তাই নিজের যেকোনো সমস্যার কথা বড়দের সাথে শেয়ার করতে হবে। সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসে। আর তরুণদের মাদককে না বলতে ও পড়ালেখার পাশাপাশি নানা ধরনের সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। এছাড়া সমাজসেবা ও সমাজউন্নয়ন এমন ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। আজকের তরুণরা একদিন এই দেশের হাল ধরবে। তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব। অনেক সময় পরিবার থেকে তাদের অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় ও তাদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাবা-মায়েরা নিজের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন সন্তানের উপর তার অনিচ্ছার সত্ত্বেও চাপিয়ে দেন। এতে হতাশা থেকে সন্তানেরা আত্মহত্যা করে। তারা কোন পথে হাঁটতে চায় সে সিদ্ধান্ত তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

## প্রবীণদের আত্মহত্যা

প্রবীণদের আত্মহত্যা হার বাংলাদেশে কম হলেও ফেলে দেওয়ার মতো না। প্রবীণদের আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে একাকিত্ব ও শেষ বয়সে নিজেকে বোঝা মনে করা। বেশিরভাগ সন্তানেরা নিজের পড়ালেখা শেষ করে যে যার মতো অন্য শহর কিংবা দেশ ছেড়ে চলে যায়। আবার অনেকে মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের সঠিকভাবে যত্ন নেওয়ার মানুষও থাকে না। সন্তানেরা তাদের বারবার কটূ কথা শুনিয়ে থাকেন এবং তখন তারা নিজেদের পরিবারের বোঝা ভাবে ও বিষণ্নতার শিকার হন। এই বিষণ্নতাই একসময় গিয়ে আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবারের প্রবীণদের অনুভব করাতে হবে যে তারা এখনও পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। যেকোনো পারিবারিক আলোচনা তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে হবে ও তাদের যেকোনো সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার প্রবীণ বাবা-মাকে সময় দিন। সম্ভব হলে যেকোনো একটি ছুটির দিন তাদের নিয়ে বেড়াতে যান। তারা যাতে নিজেকে বোঝা মনে না করেন। এছাড়া তারা যেন নিজেদের প্রিয় কাজ করতে পারে ও নতুন কিছু শিখতে পারে।

পরিবারের প্রতিটা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখুন। আপনি হয়তো জানেন না পরিবারের কোনো সদস্য আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকলের সাথে মন খুলে কথা বলতে হবে ও প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। আত্মহত্যা কখনো কিছুর সমাধান না এই বিশ্বাস মনে ধারণ করতে হবে। আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কাজ করার দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের না, আমার আপনার সবার।